Jalarka – Prabandho – Others – Collage Tin Ritu – Ashakendu Senguptta

জলার্ক - কলেজে তিন ঋতু - অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

ভূমিকা

শিক্ষা কমিশন (১৯৯২), যাত্রি কমিশন নামে পরিচিত, জানাযাচ্ছে ১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চি মবঙ্গের কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০। পশ্চি মবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৯৯৬-৯৭) ঐ সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৩,১৭,৫১৯ (এর মধ্যে সম্ভবত পাস - কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী হিসেব নেই)। ২০ বছর আগে এ রাজ্যে কলেজের সংখ্যা ছিল ২২৫, এখন তার সংখ্যা ৩৭৪। পশ্চি মবঙ্গ সরকারের দাবি) এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষা দ্রুত তালে সাফল্যের পথ বেয়ে চলেছে এগিয়ে, জনগণের দাবিতে জনগণের সেবায় উচ্চশিক্ষার দরজা সকলের জন্য খোলা। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ-রাজ্যে অষ্ট প্ররিকল্পনার শেষ বছরে উচ্চশিক্ষার মূল প্রাণকেন্দ্র সাধারণ কলেজগুলির পরিবেশও পরিস্থিতি কেমন তা আলোচনার উদ্দেস্য নিয়েই এই নিবন্ধ। একটি কলেজ-বর্ষে ছাত্রভর্তি, ছাত্র সংসগ নির্বাচন আর পরীক্ষা - এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল তিন ঋতু।

প্রথম ঋতু

ঋতুর নাম ছাত্রভর্তি। প্রতি বছর মাধ্যমিক ফল প্রকাশের পরদিন থেকে ছাত্রভর্তি ঋতুর সব লক্ষণ। প্রকাশ পায় কলেজে কলেজে (যে সব কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয়)। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে সে হল জুলাই মাসের শুরু। অসহ গরম, অন্তত দক্ষিণবঙ্গের গরম, বিরক্তিকর। কলেজের গেটে উঁকি মারে লাইনের মুখ। আবেদনপত্র সংগ্রহের লাইন। প্রার্থী স্ষয়ং অথবা আপনজন কেউ কিছু আশা কিছু আশংকা নিয়ে লাইনে। পাক মেরে পাক মেরে লাইনের লেজ কোন এক গলির মধ্যে ঘাড় গুঁজে দম নিচ্ছে। ভিড় যেখানে স্ফভাবত সেখানে কিছু হৈ চৈ, গণ্ডগেগাল, গুজব, গালমন্দ, ঠেলাঠেলি। চোখে ধুলো দিয়ে বোকা বানিয়ে কেউ লাইনে ঢুকে পড়ল নাকি! পাড়া বুঝে দাদা, হাফ-দাদাদের কবজির জোর নিয়ে ফিসফিসানি - চেনাজানা আছে নাকি ভাই? থাকলেও বলে নাকি কেউ! এখন তো লাইন লাগাও। কোথাও লাইন পড়ে শেষ রাত থেকে। দূর দূর থেকে মানুষ আসে। নিশিযাপনে শরীরসংস্থা বিরূপ হয়, চাপ পড়ে মনে, মনে মনে অঙ্ক কষা চলে। এক অঙ্ক মুছে অন্য অঙ্ক। প্রতি বছর যে হারে উত্তীর্ণ ছাত্র - ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ে সে হারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ে না। ঠাঁই মিলবে তো? এখানে না অন্য কোথাও? তিন চার জায়গায় অন্তত চেষ্টা করতে হবে। উচ্চশিক্ষা শুরু হবে। প্রাইভেট টিউটরের টোলে নাম লেখানো হয়ে গেছে, এখন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খাতায় ছাত্রের নামটা তো তুলতে হবে। উচ্চশিক্ষা মন্দির প্রবেশ - অধিকার চেয়ে আবেদন করতেই ছুটে আসা, লাইনে দাঁড়ানো।

'মন্দির', 'আবেদন' এ-সব শব্দ এ-যুগে এ-রাজ্যে তেমন পছন্দের নয়, উচ্চারণে জিভ আড়ষ্টবোধ করে। দুটো শব্দই তার ার্থ ও ব্যঞ্জন হারাতে বসেছে। যেমন 'আবেদন' - এর চেয়ে পছন্দ বেশি আমাদের, অন্তত এক্ষেত্রে, 'আদায়' শব্দটি। ক্ষেত্রবিশেষে 'মন্দির' শব্দটিতে তেমন আপত্তি নেই, পুজো-পার্বণ তো বেড়েই চলেছে, ইটপুজো থেকে গণেশ - পুজো, গণেশকে দুধ খাওয়ানো - কিন্তু ঐ শব্দের ছায়া ছুঁয়ে যদি 'ভক্তি' বা 'পবিত্রতা' ইত্যাদি শব্দ উঠে আসতে চায় তাহলেই সমস্যা। শিক্ষায়তনের সঙ্গে মন্দিরের তুলনায় তো সমস্যা নয়। শিক্ষামন্দির বলতে চায় যদি কেউ, আজও, না হয় বলুক। কিন্তু তার প্রতি ভক্তি নিবেদন, তার প্রাঙ্গণের পবিত্রতা রক্ষা করা) এসব সামন্ততান্ত্রিক পচাগলা ধারণা অগ্রহণযোগ্য।

ফর্ম দেবার কাউণ্টার খুলে গেলে লাইন সামান্য ঝাঁকুনি খেয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে বুড়ো মোষের মত এগোতে শুরু করে। লাইনে দাঁড়িয়ে যারা, তাদের অনেক গত পুজোর এক মাস আগে দেশভ্রমণ বা তেমন কিছু কারণে রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারের লাইনে ছিল। সেখানে জোচ্চুরি, গুঁতোগুঁতি, দালালের আসা - যাওয়া, অক্ষমের আন্দোলন, প্রবল হল্লা ইত্যাদি যেমন যা ছিল বাস্তবিক, তারই বর্ণ-গন্ধ ছেঁকে তুলে এনে কেউ কেউ এখানে ছড়ায়, অশালীন অভব্য আচরণ করে, সামান্য বিভ্রান্তির মূলে প্রবল হাওয়া যোগাতে থাকে। তারা সংখ্যায় সাধারণত কম, বেশ কম। কিন্তু বাদবাকি মানুষ নিবিরোধ নিবিচার মেনে নেয়। নিশিযাপন এবং/ অথবা অন্য আর পাঁচটা উদ্বেগ - অশান্তি মাথায় ও শরীরে বয়ে লাইনে দাঁড়ানো মানুষ যদি সামান্য রঙ্গরসে ভেজা হল্লায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগদ দিয়েই ফেলে সে আর তেমনী দোষের? আর ভক্তি বা পবিত্রতার কথা বলবে কে, ভেতরে তো বিগ্রহ নেই!

বিগ্রহ নেই বটে, কিন্তু এ সময় অনেক কলেজে জোর কদমে ক্লাস চালু হয়। কিছু কলেজে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক পরীক্ষা। এ সময়কলেজে রয়েছে শুধু একাদশ শ্রেণী আর প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী। লাইব্রেরি, লেবরটরিতে ভিড় কম;আগ্রহী ছাত্র - ছাত্রীর অনুকূল পরিবেশ, ছাত্র - শিক্ষক পরস্পরের কাছাকাছি থাতার সুযোগ পায়। অথচ পায় না! ঠিক এই সময় ফর্ম নিতে আসা জনতার চাপে শিক্ষাপ্রাঙ্গণ কলরব - মুখরিত। বিভ্রান্ত চড়ুই শালিখও এখন পথ ভুলে ঢুকে পড়তে পারে ক্লাসঘরে। বাইরের প্রবল তীক্ষ্ণ শব্দ - ঢেউ বারে বারে ক্লাসঘর, লাইব্রেরি, লেবরটেরির দরজা জানালা ডিঙিয়ে আছড়ে পড়ে ভেতরে, ব্যবস্থাদির ভিত অবধি যেন কাঁপিয়ে দিতে পারে। তবে, শুধু কি ঐ জনতাই দায়ী শিক্ষায়তনের শান্ত মনোরম পবিত্র পরিবেশ দূষণে? না। এই তো সময়, হবু পড়ুয়ারা অথবা তাদের অভিভাবকরা এসেছেন, তাঁদের জানাতেই হয় যে কলেজে ছাত্র সংগঠন আছে, ছাত্র সংসদ আছে এবং ছাত্রস্মর্থে শিক্ষাস্মর্থে তারা সদাজাগ্রত। কেন শূন্যপদে শিক্ষক নেই, কেন ঐ বিষয়ে অনার্স খোলা হল না এখনও, নিয়মিত ক্লাস হয় না কেন ইত্যাদি - কর্তৃপক্ষ তুমি জবাব দাও। উদ্যমী মেতা-হাফনেতা-সিকিনেতা দলবল যা হোক যেভাবে হোক জুটিয়ে পরিক্রমায় বেরোয়। স্লোগানে, পোস্টারে, বক্তৃতায় আসর গরম করতে হয় এ-সময়। এই তো সময় জমি দখলে রাখার, জমির দখল নেবার। ছাত্র নিজে যদি পরম আপন বিদ্যালয়ের পবিত্রতা রক্ষার আগ্রহী না হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ দূষণে ছাত্র নিজেই যদি তৎপর হয় তো অন্য কাকে দোষ দেবেকে এবং কেন? আবার, এমন প্রশ্নও কেউ করতেই পারেন আসর গরম করার ঐ মহড়ায় ছাত্র থাকে ক'জন? একথা সত্য যে ছাত্রসংগঠন বা ছাত্র সংসদের এমন ধারা কোন কার্যক্রম আছে টের পেলেই আজকাল ছাত্ররা প্রায় সকলে কেটে পড়ে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে বদলাতে থাকে ছবি। এক পা এক পা করে মানুষ এগোচ্ছে ফর্ম - বিতরণ - কেন্দ্রের দিকে। এগোনোর গতি এমন মন্দ যে মানুষের শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা ও মগজে সংশয় বাড়তে থাকে। সংশয় এই-কাউন্টারের সামনে হচ্ছেটা কী? নিয়ম মেনে চলছে সব? না হলেই তালগোল পাকিয়ে যাবে আজকের ও আগামী দিনের পরিকল্পনা। এখানেই যদি বেলা যায় তেবে অন্য জায়গায় পৌঁছানোই যাবে না। আর অনিয়ম হলে রুখবে কে? একজন যদি অনিয়মে বাধা দেয় - এখন দেশের অন্যত্র যা ঘটে - দশজন অনিয়মের সুযোগ নেবার ফন্দি আঁটে।

কাউন্টারের কাছাকাছি এলে বোঝা যায় কাউন্টার আর কিউয়ের মুড়োর মাঝে পাঁচ দশজনের ঢাল রয়েছে। তারা ছাত্রকর্মী। তারা মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড দেখে, পরামর্শ দেয়, বাঁকাচোরা লাইন সোজা করে। কোন কোন কলেজে ফর্ম বিক্রির পুরো দায়িত্ব তাদের। কোথাও শিক্ষাকর্মী, শিক্ষক আর 'ওরা' মিলে মিশে কাজ করে। ওদের সাহায্য নিতেই হয়। কলেজ-অফিসের খুব বেহাল অবস্থা। গত বিশ বছরে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে অস্মাভাবিক হারে, নতুন বিষয়, নতুন শাখা খুলেছে। উচ্চমাধ্যমিক কোর্স কলেজে আসার পর ঐ চাপেই তো কলেজগুলো দিশাহার। অথচ কর্মীসংখ্যা কার্যত বাড়েনি। শিক্ষকসংখ্যা কার্যত কমেছে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী কেউই ছাত্রভর্তির হল্লা সামাল দিতে এগোতে চায় না। বাইরের মানুষ এসব বোঝে না, বুঝতে চায় না। তাদের কানে শোনা বা কাগজে পড়া খবর ছাত্র ইউনিয়ন ভর্তির বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না, করতে পারবে না। তবু তারা আছে কেন? কলেজে ক্লাস নেই তো শিক্ষকরা করছেন কী? তাঁরা তো প্রচুর মাইনে পান, জনগণের টাকা) তাঁরা কেন দল বেঁধে এগিয়ে এসে বোঝা তুলে নিতে পানেরনা? আরও চার পাঁচটা কাউন্টার কি খোলা যেত না?

ছাত্র ইউনিয়ন ভর্তির কাজে নাগ গলাক সরকার তা চায় না। এ-হল সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি। ইউনিয়নও সরাসরি এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে না। তারা নাক গলাতে চায় না, তারা নজর রাখতে চায় কেবল - সব ঠিক চলছে কিনা। কর্তৃপক্ষকে, ছাত্রকে, অভিভাবককে তারা সাহায্য করতেই এগিয়ে আসে, পাশে দাঁড়ায়, সহায়তা কেন্দ্র খোলে। আর, যেখানে কর্তৃপক্ষ অযোগ্য, অপদার্থ বা অক্ষম সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা, নিয়মনীতি রক্ষার দায়িত্ব তারা কাঁদে তুলে নিতে বাধ্য হয়। তাই তো, পরিস্থিতি তেমন হলে)।

শিক্ষকরা ভর্তির কাজে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে না এমন নয়। একাংশ পূর্ণ সহযোগিতা করে, একাংশের দ্বিধা থাকে। একাংশ তো সময় মেনে ক্লাসও নিতে পারেন না, তাঁদের কোন কাজেই পাওয়া যায় না তো ছাত্রভর্তির মত দুরূহ কাজে পাবার আশাও করে না কেউ। এটা একটা মজার দিকও বটে;যারা কোন দায়িত্ব নেয় না তারা তেমন একটা 'ইমেজ'ও তৈরি করে ফেলে - ওরা এসব কাজ পারে না, ওদের ছাড়। এবাবে একদল ঘরে ও বাইরে বেশ কিছু কাজ, যা কিনা তাদেরই করার কথা, না করেও জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। তো এই অংশের কোনও নিন্দা হয় না, কাজ না করলে আর নিন্দা করার সুযোগ কই? যারা কাজ করে নিন্দেমন্দ তাদের ভাগে জোটে। শিক্ষকদের (যাঁরা কাজ করেন) ভাগে নিন্দেমন্দই জোটার কথা। তাঁরা যদি কঠোরভাবে নিয়ম মেনে কাজ করেন তো সাংঘাতিক গোলযোগ দেখা দেয়। নিয়ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চললে সততা ও নৈতিকতার বোধ মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি দেশের আইন - কানুনর ভয় আছে। শিক্ষকরা মাঝামাঝি একটা পথ নেবার চেষ্টা করেন। অধিকাংশ শিক্ষক এই মধ্যপন্থী হবার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সবই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

ফর্ম পাওয়া, তারপর জমা দেওয়া, তারপর তালিকা বেরোনোর অপেক্ষায় তাকা। তালিকা তৈরির একটি সুনির্দিষ্ট সরকারি বিধি আছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের জন্য যথাক্রমে ২২ শতাংশ ও ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। বাকি আসন সাধারণের,তালিকা মেধাভিত্তিক।

তালিকা তৈরির কাজে শিক্ষকরা সর্বত্র সাহায্য করেন। মেধাভিত্তিক তালিকাই তৈরি হতে থাকে। অন্যদিকে, এ-সময় বিশিষ্ট কর্তা-ব্যক্তিদের অনুরোধ আসতে থাকে অধ্যক্ষের কাছে। কেউ টেলিফোন করেন, কেউ চিঠি দেন। এঁরা কেউ মন্ত্রী, কেউ আমলা, কেউ জনপ্রতিনিধি। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, সমাজসেবী কেউ বাদ থাকেন না। আর আছে ছাত্রনেতারা, তাদের অনুরোধের তালিকা বেশ লম্বা - চওড়াই হয়। তালিকা মেধাভিত্তিক হতে হবে, 'অনুরোধ' ও রাখতে হবে। নইলে পিলে চমকানো স্লোগান উঠতে পারে লড়াই লড়াই লড়াই চাই। ভর্তি - তালিকা ছিঁড়ে ফেলতে পারে ওরা কোন অজুহাতে। কোন গোলমালে, কোন সমস্যায়, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিরূপ হলে অধ্যক্ষ কোণঠাসা হবেন। তাঁগে শ্যামও রাখতে হবে, কুলও রাখতে হবে। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে মেধাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করেও অনুরোধ রক্ষার পথ হাওয়া যায়। পথ একটা নয়, অনেক। তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন একটা পথ। সংরক্ষিত আসনে মোট ২৮ শতাংশ প্রার্থী অধিকাংশ কলেজে, বিশেষত প্রদান প্রদান শহরাঞ্চ লে, পাওয়া সম্ভবহয় না। মেধা-তালিকায় যে সব নাম তাকে তারাও সকলে আসে না। এমন প্রার্থী অনেক যারা একই সঙ্গে একাধিক কলেজের তালিকায় স্থান পায়। এও একটা মস্ত ফাঁক বটে। উল্লেখিত দুটো পথে এগিয়ে অধ্যক্ষ 'অনুরোধ' বেশ কিছুটা রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চি ত করতেপেরেন। প্রথম তালিকা এবং বহুক্ষেত্রে দ্বিতীয় তালিকাও মেধাভিত্তিক হয়। কিন্তু তারপরও কিছু আসন ফাঁকা থাকে, অন্তত কিছু শাখায়। 'অনুরোধ' সমস্যা তেমন জটিল হলে অধ্যক্ষ 'ওয়েট-লিস্ট'-এ ঝুঁকি নিয়ে কিছু কেরামতি করতে পারেন।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তির প্রাথমিক পর্ব শেষ হতে না হতে সে পড়ে ডিগ্রি স্তরের ভর্তির হাঙ্গামা। একই নাটকের পুনরাবৃত্তি।

যারা ভর্তি হতে পারে না পছন্দের কলেজে এবং যদি তাদের খুঁটির জোরও না থাকে তো তারা নানা দুর্নীতি আর অনিয়মের গন্ধ পায়ছ, গুজব ছড়ায়। কিন্তু দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করার সাহস নেই কারও। অথবা, কারও যদি সাহস থাকে তো তথ্য থাকেনা, সাহস ও তথ্য থাকলেও প্রমাণ করার জন্য লড়াকু মনের জোর বা উদ্যম থাকে না।

অনির্দিষ্ট অভিযোগ কিছু থাকে। তার মদ্যে নতুনত্ব নেই। একটা অভিযোগ ছাত্র সংগঠন টাকা নেয় ভর্তির জন্য। অভিভাবকদের কিছু টাকা সংগঠন কর্মীদের হাতে দিতে হয় এ কথা অসত্য নয়। কিন্তু তাঁরা তো দেখেছেন যে ভর্তির মরশুমে সকাল থেকে সংগঠনকর্মীরা 'মহামূল্যবান' ক্লাস ছেড়ে কমনরুমে বা ইউনিয়ন অফিস ছেড়ে, ক্যান্টিন ছেড়ে পাবলিকের সেবায় লগি ঠেলেরছে। তাদের তো দানাপানি লাগে। তারপর আরও আছে, যেমন ধরুণ ইউনিয়নের 'সোস্যাল', 'ফ্রেশার্স ওয়েলকাম' ইত্যাদি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। সে-সবে বিস্তর খরচ। সরকার গত বিশ বছরে ইউনিয়নের চাঁদা তেমন বাড়াতে দেয়নি। জনপ্রিয় সরকার জনগণের কথা বাবে বলেই চাঁদা বাড়ানোর প্রস্তাবে সহজে হ্যাঁ বলতে পারে না। অন্যদিকে, ইউনিয়নকেও টিকিয়ে রাখতে হবে। তাদের কিছু দিয়েও মোট যা খরচ পড়ে তা আর এমন কী, এ-রাজ্যে উচ্চশিক্ষাও তো কার্যত অবৈতনিক।

অন্য একটি অভিযোগ মেধা তালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও কিছু ছাত্রছাত্রী কোনও কায়দায় প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়।

এককালে এ রাজ্যে প্লেয়ার্স কোটা, এমপ্লয়িজ কোটা ইত্যাদি নাম অলিখিত কোটা ব্যবস্থা ছিল। এখন তেমন ব্যবস্থা প্রায় কোথাও নেই। অন্তত সরকারি হিসেবে নেই। এখানে এমনকি 'পিছড়ে-বর্গ'-র কোটাও নেই। এখানে মেধা- তালিকা টপকে যে কেউ বা কারও ভাগ্নে - ভাগ্নীরা ঢুকে পড়তে পারে না। কিন্তু মেধা-তালিকা মেনে ভর্তির পর যদি আসন ফাঁকা থাকে তখন তো অধ্যক্ষকে ব্যবস্থা নিতেই হয়। মেধা - তালিকা প্রস্তুত করার মত বিরক্তিকর কাজ তো দফায় দফাল করা যায় না। তাই তখন 'ইচ্ছুক প্রার্থীদের আবেদন' গ্রহণ করা হয়। জনগণের স্বার্থেই এসব করতে হয়। আসন ফাঁকা রাখা যায় না।

পলকা অভিযোগ বা দুঃখ-অভিমান-ক্ষোভ প্রকাশ অনর্থক। মন্ত্রীরা দফায় দফায় বলেন, ব্যবস্থা কিছু না কিছু হবেই। খোঁজ রাখুন। নিজের পছন্দমত ব্যবস্থা চান যদি তো সে ব্যবস্থাও করা যায় বৈকি। খোঁজ রাখানু। খোঁজটা কোথায় কার কাছে সে কথাও যদি বলে দিতে হয় তো তেমন অপদার্থের এ রাজ্যে কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

এখানে ভর্তিতর ব্যবস্থা এমন যথাযথ যে কোথাও কোন গণ্ডগোল হবার কথা নয়। তবু দু'চারটে গণ্ডগোলের খবর আসে। কেদিকে কারও নিয়ম মেনে চলার গোঁয়াতুমি, অন্যদিকে প্রকাশ্যে, নিয়ম ভাঙ্গার কারও কারও প্রবল উৎসাহ এইসব গণ্ডগোলের মূল কারণ। এ-সব গোলমাল মফঃস্বলে সাধারণত একটু বেশি। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, সংবাদ মাধ্যম মফঃস্বলের খবরে বিশেষ রত্ব দিতে পারে না। শহর কলকাতায় বড় কোন গোলমাল হলে সব পক্ষই বিব্রত হ'ন। সব দলেরই 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ আছে, তারা সে-সব সামলায়। তার ফাঁকে দু'চারটে অস্বস্তিকর খবর প্রকাশ পায়, কিন্তু জনগণের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তাই তার রেশ থাকে না বেশিদিন।

ভর্তি পর্বে সবচেয়ে অশান্তিতে দিন কাটে অধ্যক্ষর। তাঁর দক্ষতা - যোগ্যতার পরীক্ষা চলে এ-সময়। এই পর্ব শেষ হয়েও শেষ হয় না। কোন কোনে কলেজে অনুরোধের চাপ এতই বেশি হয় যে নানা চোরাগোপ্তা পথেও সকলের সব অনুরোধ রক্ষা করা যায় না। কিন্তু অধ্যক্ষ কাউকেই অখুশি করে কলেজ চালাতে পারেন না। পাশের রাস্তায় বাস সামান্য জোরে দৌড়ে গেলেও কলেজ-বাড়ি কাঁপে, কলেজের জন্য টাকার তদবিরে গেলে বিকাশভবনে কোনও মেজবাবু কি বড়বাবুর টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকতে হয়, বিক্ষোভের দিনে পুলিশের গাড়িতে বাড়ি ফিরতে হয় - কলেজ চালানো সহজ কর্ম তো নয়। তাই সকলের অনুরোধ, সব আবদারই রক্ষা করতে হবে। তেমন বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিলে অধ্যক্ষ আসনসংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারেন। আসনসংখ্যা বাড়ানোর কিছু বিধিবদ্ধ রীতিনীতি আছে। সংবাদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রশ্ন আছে। কিন্তু সংসদ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমনই সব সাংঘাতিকসমস্যা নিয়ে নিত্য নানাবিধ চাপে জেরবার যে তাদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি র মত তুচ্ছ বিষয়ে বিব্রত করা কি উচিত? জনস্বার্থের কাজ করার সময় অধ্যক্ষ যদি সামান্য রীতিনীতি এড়িয়ে যান তো সে সব উপেক্ষা করা যায়।

কলেজে ছাত্রভর্তি সমস্যার একটা প্রধান কারম নিশ্চ য় সাধারণ উচ্চশিক্ষার পথ সকলের জন্য খোলা রাখা। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা আকর্ষণহীন -এও একটা কারণ বটে। পরিকল্পতি পথে নতুন নতুন কলেজ খোলা হলে ছাত্র - সংখ্যা বৃদ্ধি র চাপ নেকটা সামলানো যেত। ১৯৭৭ সালে ২৪১ টি কলেজ ছিল, ১৯৯৪ -এ সেই সংখ্যা হয়েছে ৩৫৭। বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য। তবু চাপ বেড়ে চলেছে তার কারণ নতুন কলেজগুলি যে কেবল শিক্ষার স্বার্থ বা প্রয়োজনে খোলা হয়েছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা রাজনৈতিক কর্তাদের আবদারে খোলা হয়েছে (১৯৭৭ -এর আগেও এমন হত)। ২৫০ বা তারও কম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এমন কলেজই ৬৯টি, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০০-র কম এমন কলেজ সংখ্যায় ৮০টি (Annual Report of the Higher Education 1996-97)। ১৯৯৫-৯৬-এ ঐ সরকারি রিপোর্টে কিন্তু সংখ্যাদুটি ছিল যথাক্রমে ৪৮ ও ৪৭। সরকারি সংখ্যাতত্ত্বে ভরসা রাখা সহজ নয়, সে যাক। একটা কথা পরিষ্কার যে, সরকারি নীতি ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি তে সাহায্য করে, কিন্তু সেই একই সরকারের এমন নীতি নেই যা কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ কমাতে সাহায্য করবে। যে-সরকারের ঘোষিত নীতি এই যে ভর্তির তালিকা হবে মেধা - ভিত্তিক এবং ভর্তির কাজে কেউ নাক গলাতে পারবে না, সেই সরকারের মন্ত্রী -আমলা - বিবিধ পদাধিকারী ভর্তি সুপারিশপত্র পাঠায়। ভর্তির মরশুমে কলেজে কলেজে ছাত্র সংসদ কর্তৃত্ব করে। তা সত্ত্বেও, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত - সব ঠিক হ্যায়। অতএব, সব ঠিক হ্যায়।

দ্বিতীয় ঋতু

কলেজ প্রাঙ্গণের সবচেয়ে রঙিন কোলাহলমুখর ঋতু নির্বাচন। পুজোর ছুটির পর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সাধারণত কলেজেকলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ঋতুর স্থায়িত্ব অনিশ্চি ত অনেকটাই। নির্বাচনের দিন ঘোষণার সামান্য আগে থেকেই এই ঋতুর আগমন হয়। সংসদ গঠনের দিন পর্যন্ত স্থায়ী হবার কথা, কিন্তু বহুক্ষেত্রে নানা হাঙ্গামা ও তার প্রতিক্রিয়ায় এই ঋতুর বিদায় বিলম্বিত হয়। সেই সব প্রাঙ্গণে এই ঋতু আরও রঙিন সন্দেহ নেই।

কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল স্বীকৃত নয়। কিন্তু কার্যত প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রকাশ্যে আসরে নামে। স্লোগান, পোস্টার, দেওয়াল লিখন, মিছিল, প্রচারপত্র, গেট মিটিং সব আয়োজন মিলে যে টানটান উত্তেজনাসৃষ্টি হয়, যে উত্তাপ ছড়ায়, যে আবহ তৈরী হয়, তার সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের তুলনা চলে।

সামান্য ভুল হিসেব, কারও মুহূর্তের কোনও উত্তেজনাপ্রসূত ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ায় অথবা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ যে কোনও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের উত্তেজনা বিস্ফোরক স্তরে উঠে যেতে পারে। কোথাও সুকৌশলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হাঙ্গামার ফাঁদ পাতা হয়। দুষ্কৃতী বা সমাজবিরোধীরাও এখানে সেখানে আসরে নামে। সন্ত্রাসের আবহ তৈরী হয়। তার মধ্যেই জমা পড়ে মনোনয়নপত্র। মনোনয়নপত্র জমা দেবার রাউণ্ডেই এক দফা শক্তিপরীক্ষা হয় কোন কোন কলেজে।

পরের রাউণ্ড মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার। প্রার্থীদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে দলীয় কর্মী - সমর্থক - সৈন্যসামন্ত। কোথাও কেউ বাবা - বাছা করে, কোথাও সরাসরি ভয় দেখায়। যে অঞ্চ লে যে দলের বাহুবল বেশি যে অঞ্চ লে সেই দলই সন্ত্রাস সৃষ্টিতে বেশি সক্রিয় হয়। অবস্য, বাইরের থেকে দলবল এনে হামলা করারও প্রচুর নজির আছে। অনেক কলেজে সন্ত্রাসের প্রভাবে প্রতিপক্ষ প্রার্থী দাঁড় করাতেই পারে না। 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী' পক্ষের জয়ের গোপন মন্ত্র প্রায় সর্বত্র একই সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাস।

প্রত্যাহার পর্ব শেষ হলে প্রচার তুঙ্গে ওঠে একদিকে, অন্যদিকে হাঙ্গামা ও প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলার প্রস্তুতি চলতে থাকে। কলেজ খোলা থাকে, ক্লাসও নিয়মিত হবার কথা, কিন্তু এ-সময় কার্যত পড়াশুনার ছুটি। ছাত্র - ছাত্রীরা গোলমালের আশঙ্কায় কলেজ প্রাঙ্গণ এড়িয়ে চলে। কিন্তু ভোটের দিন তো ভোটার চাই। দু'পক্ষই তৎপর হয় ভোটার সংগ্রহে। উত্তেজনা

চরমে ওঠে। কুৎসা রটনা, ভীতি প্রদর্শন, জাল ভোটের ঘটনাও ঘটে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে।

এক কালে সমস্যা খুব গুরুতব আকার ধারণ না করা পর্যন্ত কোন অধ্যক্ষ শিক্ষা-প্রাঙ্গণে পুলিশ ডাকতেন না, ঢুকতে দিতেন না।সংস্কার বা প্রচলিত ধারণা চিল যে, পুলিশ ঢুকলে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। সে অন্ধবিশ্বাস গেছে। এখন অধ্যক্ষরা, শুধু ছাত্র সংসদ নির্বাচন নয়, আর্য় ছোট - বড় নানা উপলক্ষে, গোলমাল হলেও হতে পারে এমন সংশয় উপস্থিত হলেই, পুলিসের সাহায্য চান। পুলিসও এখন তাই রীতিনীতি মানতে তেমন প্রয়োজন বোধ করে না। তারা পরিস্থিতি বুঝে ঢুকে পড়ে। আবার, এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয় যখন পুলিসের সাহায্য চাইলেও পাওয়া যায় না অথবা, এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয় যখন পুলিসের সাহায্য চাইল্যে পাওয়াযায় না অথবা পুলিশ দেরিতে আসে। পুলিশ ভেতরে এলে যে পক্ষের অসুবিধা হয় তারা তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয় কলেজে পুলিশ এল কেন, অধ্যক্ষ তুমি জবাব দাও !

নির্বাচন ঋতুতে নানা পক্ষ শুধু যে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তা নয়, তারা সর্ব পক্ষই অধ্যক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বির্ক্ষেভ সমাবেদ, নিঃসন্দেহে প্রদর্শনী, বহু সময় শালীনতার সীমা ছাড়ায়, রঙ্গ ব্যাঙ্গে নিম্নরুচির ছাপ থাকে। পেশিশক্তির নির্বোধ আস্ফালন ঘোষিত হয়। তাদের অভিযোগের তালিকায় সত্য ও মিথ্যা মেশানো থাকে, শিক্ষা ও শিক্ষা - সম্পর্কহীন দাবি একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বহু ক্ষেত্রে এই যে, অধ্যক্ষর বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়টা নানা দল সুষ্ঠভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তারা কোন এক জায়গায় বসে আলোচনা করে সময় ভাগাভাগি করেএমন কথা বলার মত নিশ্চি ত প্রমাণ নেই, কিন্তু এক পক্ষ বিদায়, নেবার প্রায় সাথে সাথে অন্যপক্ষ যে-কায়দায় ঝাঁপ দেয় তাতে গোপন বোঝাপড়ার ইঙ্গিত থাকে।

নির্বাচনে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এমন অভিযোগের প্রায় সবটুকু অনুমান - নির্ভর, আসর গরম করার কৌশল অথবা কুৎসা রটনা। একথা অবস্য সত্য যে, প্রধানত বেসরকারি কলেজে, শিক্ষকদের একাংশ সরাসরি রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী বা কর্মী সমর্থক এবং তাঁরা অনেকেই ছাত্রসংসদ নির্বাচনে নিরপেক্ষ অবস্থান ছেড়ে, অথচ নিজেকে আড়ালে রেখে, নিজ নিজ দলের ছাত্র সংগঠনকে নানা ভাবে, সাহায্যের চেষ্টা করেন। দিন দিন যেন সেই আড়ালটুকুও স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। তাই অভিযোগ ভিত্তিহীন নাও হতে পারে কিন্তু পক্ষপাত প্রমাণ করা সহজ নয়।

ছাত্রদলের পেছনে যেসব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন থাকে তারা যে কায়দায় সাধারণ নির্বাচনে গুজব ও কুৎসার বেসাতি করে সেই একই কায়দা কলেজ নির্বাচনেও প্রয়োগ করে। এমনও বলা যায় যে, কলেজ নির্বাচনই 'নেট প্র্যাকটিস' - এর জন্য বেছে নেয় তারা। সমস্যা এই যে, কলেজ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারর মূল ভিত্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যা একবার কলঙ্কিত হলে পূর্বাবস্থায় কোনভাবেই ফিরে আসতে পারে না। তার জন্য অবশ্য এ রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আদৌ উদ্বিগ্ন নয়।

ছয়ের দশকের ছাত্র আন্দোলন ও তার আগের দশকের আন্দোলনেও সংগঠন - গুলির লক্ষ্য ছিল ইউনিয়ন দখল করা, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইউনিয়ন দখলই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। সে কালের ছাত্র আন্দোলনে নির্দি,ট রাজনৈতিক দর্শন ধ্বনিত হত। এখন হয় না। এখনকার ছাত্র জানে মিছিলে যে-আওয়াজ ওঠে তা ফাঁকা বুলি, প্রচারপত্রে যে-দাবি ঘোষিত হয় তা নির্ভাচনী চমক।১৯৭৭-এর পর দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে বারে বারে। সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের স্বরূপ প্রকাশিত। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, দলবাজি, অযোগ্যতা, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি যাবতীয় অভিযোগ সব দলের বিরুদ্ধেই শোনা যায় এবং তা সাধারণ বুদ্ধি তে প্রমাণ করাও অসম্ভব নয়। তাই যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ছাত্রসমাজ কোন একটিও রাজনৈতিক দল খুঁজে পায় না যাকে সমর্থন কার যায়। অন্য দিকে, দলনিরপেক্ষ ছাত্র আন্দোলনও যে গড়ে উঠছে না তার কারণ ছাত্রমহলে একই সঙ্গে উচ্চাভিলাশ ওগভীর হতাশা ক্রিয়াশীল। নকশালপন্থী আন্দোলনের হঠকারিতা ও ব্যর্থতাও বিকল্প সন্থানে ভাঁটা পড়ার অন্যতম এক কারণ বলেই মনে হয়।

এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীর দ্রুত রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, পৌঁছে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর রাজনীতিহীন (apolitical) এক অবস্থানে। এই পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবন করার যোগ্যতা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেই। তাঁদের অনেকেই দেশপ্রেমিক, জনদরতী, তাঁরা সকলেই ধুর্ত নন, কিন্তু দুঃখের কথা, দূরদশী, প্রাজ্ঞ নেই কে। তাঁরা সঙ্গীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এমন অর্বাচীন আচরণ করেন বা অনৈতিক কর্মে সমর্থন যোগান যার পরিণতি সুখকর হয় না।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পর্কীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৮০-৮১ সালের ঘটনা। একটি কলেজের নির্বাচনে পরাজিত পক্ষ অভিযোগ আনে যে, শিক্ষকরা নিয়ম - বহির্ভূত পন্থায় প্রতিপক্ষের একজনকে একটি আসনে বিজয়ী ঘোণণা করেছেন। অতএব, নির্বাচন বাতিল করতে হবে। দাবি না মালে তারা নির্বাচনের পরবর্তী ধাপ - কর্মকর্তা (office bearers) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। কলেজ নির্বাচন কমিশনের সদস্যশিক্ষকরা যে কোন অন্যায় করেননি সে কথা আইনজ্ঞরাও স্বীকার করেছিলেন। তাছাড়া নির্বাচন ফলাফলে দু'পক্ষের আসন সংখ্যার ব্যবধান ছিল সাত-আট। তবু আন্দোলন চলতে থাকে, ফলে অনির্দি,ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখতে হয়। পরাজিত পক্ষ শিক্ষদের একাংশের বিরুদ্ধে অশ্লীল ও অশালীন ইঙ্গিতপূর্ণ প্রচারপত্র বিলি করতে থাকে শহরে। সাংবিধানিক বাধ্যতা তাকায় কর্মকর্তা নির্বচনের আয়োজন করতেই হয়, তাই কলেজ খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা, সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সুষ্টভাবে নির্ভাচন সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক সাহায্য চাওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন এগিয়ে আসতে অস্বীকার করে। তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন গভর্নিং বডির সভাপতি লো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাহায্য ও পরামর্শের আশায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে জানান যে, কলেজ নির্বাচনে কোন প্রকার পুলিসি নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে কোথাও পুলিশ যায় না। অতএব, তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে প্রথাবহির্ভূত কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। শিক্ষকরা এই পরিস্থিতিতে তাঁর পরামর্শ বা নির্দেশ লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তখন য়অবশ্য তিনি মহকুমা শাসককে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চি ত করার জন্য, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপককে নির্বাচন পর্ব শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে লিখিত পরামর্শ দিলেন !

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পরাজিত ছাত্র সংগঠনের সমর্থনে 'শ্রমিক', 'কৃষক' ও অন্যান্য সংগঠন একত্রে নির্বাচনের কাজে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করলে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। মৃদু লাঠিচার্যেই আসর প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। এবংঅনেক প্রত্যক্ষদশীর ধারণা - লাঠিচার্জ না করলে কলেজ অফিসের সরু করিডোরে ভিড়ের চাপেই কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

একটি অত্যন্ত অন্যায় আবদারের সমর্থনে একই দলের নানা শাখা সংগঠন জোট বেঁধে যে বাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং যে ভাবে প্রশাসন দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল তা ঐ এলাকায় ঐ সময় ছিল অকল্পনীয়। এমন ঘটনা ও প্রসাসনের এই আচরণে এখন আর কেউ কোথাও বিস্ময়বোধ করে না। কিন্তু ঐ ঘটনার পর আরও একটি ঘটনা ঘটে যা সঙ্গীর্ণ দলীয় রাজনীতির টানে প্রবীনরাজনীতিকের অর্বাচীন আচরণের নমুনা বলা যায়।

কর্মরর্তা নির্বচনের অল্পদিন পরে সরকারবিরোধী শিক্ষক সংগঠনের কয়েকজন সদস্যকে ঐ কজে থেকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। তার াল্পদিন পরে জানানো হয় যে, কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে, তদন্ত হবে। শিক্ষা কী, অভিযোগকারী কে ? এই দুটি প্রশ্নেই তদন্তকারী দল বিপদে পড়লেন এবং অবশেষে বাধ্য হয়ে অভিযোগপত্রটি প্রকাশ কলেন। জানা গেল অভিযোগকারী ঐ কলেজেরই একজন সহকর্মী। তিনি 'প্রিয় করেড' সম্মোধনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন। 'কারচুপি' বা 'নয়ছয়' -এর কোনও নজির বা ব্যাখ্যা ছিল না। অভিযোগকারী কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করলেন, নিঃশর্তে অভিযোগ প্রত্যাহার করেনিলেন, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। জানা গেল, ছাত্র সংগঠনের কাছে রাজনৈতিক অনুগত্যের প্রমাণ রাখতে এবং পুলিশের লাঠিচার্জে মানবিক কষ্ট পেয়ে তিনি এমন দুষ্কর্ম করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে কত না অভিযোগপত্র জমা পড়ে, আবেদন - নিবেদন - প্রার্থনা - ক্ষোভ - আশংকা নিয়ে কত মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হন। মুখ্যমন্ত্রী কি সাধারণ মানুষের আবেদন - নিবেদনে এমনই দ্রুত সাড়া দেন ? সাধারণের াভিজ্ঞতা তো তা নয়। তাছাড়া, এই ক্ষেত্রে অভিযোগের সমর্থনে কোন তথ্য ছিল না। আসলে 'কমরেড' - এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন 'কমরেড', ব্যবস্থা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই বোঝা গিয়েছিল বিপর্যয়ের ঘন্টা বাজছে। গত বছর ঐ কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বটে কিন্তু বিঘ্ন হটাতে নাকি নামাতে হয় র‍্যাফ (R. A. F) !

সম্প্রতি একটি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র নেতাদের হাতে দেখেছি মোবাইল টেলিফোন। গর্ব করার মত প্রগতি বটে ! স্কুল স্তরেও এখন ছাত্রদের কোন কোন সংগঠনের ছাত্রছায়ায় আনার চেষ্টা চলছে। ছাত্র সমাবেশ ও মিছিলে স্কুল ছাত্রদের দেখা যাচ্ছে। ছাত্রদের সংসদীয় রীতিনীতি শেখানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এইসব উদ্যোগের বিপরীত দিকে চলেছে সাধারণ ছাত্ররা, তারা রাজনীতিবিমূখ হয়ে উঠেছে। একালে যারা ছাত্র সংগঠন করে তারা অধিকাংশ সাধারণ ও অতি সাধারণ মানের ছাত্র। সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা খোলা আগে বলেই তারা অনেক কলেজ - স্তরে পড়ার সুযোগ পয়েছে। সাংঘাতিক প্রতিযোগিতায় বাজারে সোজা পথে চাকরি পাবার আশা তাদের কম। তারা অনুগত্যের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার সন্ধান করে। আনুগত্য প্রমাণে হীন পথে গোতে তাদের সংশয় বা সংকোচ হয় না। পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের সেভাবেই প্রভাবিত করে। তারা কলেজ ছাত্র - সংসদ নির্বাচনে মরিয়া হয়ে ওঠে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, দলে নিজেদের বাজার-দর বাড়াতে। আজকের ছাত্র - রাজনীতিতে প্রকৃত ছাত্র নেই, প্রকৃত রাজনীতিও নেই !

গোড়ায় বলেছি কলেজ প্রাঙ্গণের সবচেয়ে রঙিন কোলাহলমুখর ঋতু নির্বাচন। আজ ছাত্র-রাজনীতি যে - পথ ধরেছে তা যে সর্বনাশের পথ তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্ব - রাজনীতি নতুন সমীকরণ ও নতুন বিশ্ব - অর্থনীতির দাপটে দেশে দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন। এই সময়ে বিশ্বে ভারতীয় গণতন্ত্রই সবুজ দ্বীপ। এ কালের ছাত্র - যুবকদের উদাসীন রাজনীতিহীনতা যে সর্বনাশের পথ ধরেছে তাতেএই দ্বীপটিও অবিলম্বে লুপ্ত হবে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি এখনও সরে দাঁড়ায়, চাত্রদের স্বাধীন মুক্ত চিন্তা প্রকাশের ও সুস্থ বিতর্কের সুযোগ দেয় তাহলে বিপদ এড়ানো সম্ভব। এবং তখন, কেবল তখনই, কলেজ প্রাঙ্গণ নির্বাচন ঋতুতে হয়ে উঠতে পারে আনন্দে রাঙা, উল্লাসে উজ্জ্বল, সঙ্গীতময়। কিন্তু সেই সুযোগ কি তারা পাবে? সেই সুযোগ অর্জনে কি প্রকৃত ছাত্ররা আরও একবার কেরিয়ার -সর্বস্বতা বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপ দেবে?

তৃতীয় ঋতু

কলেজ ঋতুচক্রে পরীক্ষা ঋতুর আসা যাওয়া একই বছরে অন্তত তিন খেপে। ক্যালেণ্ডার - বছরের শুরুতে, জানুয়ারির গোড়ায় কলেজে স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের টেস্ট বা নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে এই ঋতুর শুরু। তারপর মাস দুয়েকের বিরতি। বিরতির পরমার্চের মাঝামাঝি শুরু হয় বি-কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষা। মার্চের শেষে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষা শেষ হলেই শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা - প্রথমে পার্ট টু, তারপর পার্ট ওয়ান। জুনের মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা প্রদান অংশ সমাপ্ত হয়। বিজ্ঞান শাখার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আসে তারপর। চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রধান অংশ শেষ হলে, অথবা ঐ পরীক্ষাসূচির ফাঁকে, স্থান পায় কলেজের একাদশ শ্রেণী ও প্রথম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা। ষান্মাসিক বা মাসিক পরীক্ষা প্রায় বিদায় নিয়েছে পরীক্ষা - তালিকা থেকে, অতএব তার কথা থাক। জুন - জুলাই মাসে পরীক্যা ঋতুর প্রদান অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং তারপর দীর্ঘ বিরতি। বছরের শেষে, নভেম্বর - ডিসেম্বরে আবার পরীক্ষা - বারো ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচনী পরীক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রদানত গ্রীষ্মাবকাশে অনুষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্যা, নির্বাচনী পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে বহু কলেজে বছরে আট - নয় সপ্তাহ পড়াশোনার কাজটা কার্যত স্থগিত থাকে। এর সঙ্গে ছুটির দিন যোগ করলে সহজেই বোঝা যাবে কেন কলেজে প্রকৃত শিক্ষাদিবসের সংখ্যা বেশ কম। কিন্তু সে আলোচনায় আমরা ঢুকব না।

পরীক্ষাপর্ব শুরু হয় স্নাতক স্তরের নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে, শেষ হয় বারো ক্লাসের নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে। এই নির্বাচনী পরীক্ষা ছাত্র ও শিক্ষক দু'পক্ষের কাছেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এককালে। শিক্ষক যা দিলেন ছাত্র তার কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছে, চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা অর্জনে এই পরীক্ষার ফল ছাড়াও, ছাত্রদের উপস্থিতির হার বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু উপস্থিতির হার নিয়ে কর্তৃপক্ষ এখন আর মাথা ঘামান না। পরীক্ষার ফলও খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় আর। শিক্ষকরা জানেন, পরীক্ষার কাতায় তিনি যা পেলেন তার প্রায় সবটুকু ছাত্র গ্রহণ করেছে 'প্রাইভেট টিউটর' -এর কাছ থেকে। মনোযোগী ছাত্র অবশ্য এখনও পরীক্ষায় ফল জানায় আগ্রহী! তারা বুঝতে চায় আরও ভাল নম্বর পাবার উপায় কী। উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র - ছাত্রীদের কাছে বার্ষিক ও নির্বাচনা পরীক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক ও উচতমাধ্যমিক স্তরের সিলেবাস ও প্রশ্নের ধরনে পার্থক্য অনেক। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাপদ্ধ তির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এই পরীক্ষাগুলি সাহায্য করতে পারে। তাদের জন্য এমন পরীক্ষা যত বেশি হয় তত ভাল। কিন্তু কলেজ সে ব্যবস্থা করতে পারে না। হয়ত তাই, দেখা যাচ্ছে 'ভাল' টিউটর অথবা 'ভাল' টিউটোরিয়াল হোমগুলিতে নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। নির্বাচনী পরীক্ষায় যাদের ফল ভাল হয় না তাদের আচরণ আগের মতই আছে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার অনুমতি না পেলে তারা চোখ কচলায় কেউ, কেউ ডাক্তারি সার্টিফিকেট জমা দিয়ে অসুস্থতার অজুহাত খোঁজে, কারও অভিভাবক এসে আবেদন করে এবং এইসব ছাত্রদের 'স্বার্থরক্ষায়' ছাত্রসংসদ অধ্যক্ষর সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক করে। বর্তমানে ছাত্রসংসদের চাপ বেড়েছে, বেড়েছে শিক্ষদের উদাসীনতা। প্রায় সকলেই চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তাই নির্বাচিত হয়। কার্যত, নির্বাচনী পরীক্ষা এখন একটা নিয়মরক্ষা।

পরীক্ষা ঋতুর প্রদান অধ্যায় সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত পরীক্ষা হয় গ্রীষ্মাবকাশে তঅই সে সময় ক্লাস নেবার প্রশ্ন নেই। এ-সময় অধ্যাপকরা এককালে পড়াশুনা বা গবেষনা করতেন কিন্তু সে কাজে এখন পরীক্ষাপর্ব প্রদান বাধা। পরীক্ষার কাজ জরুরি এবং সে কাজে অনুপস্থিতি অবাঞ্ছিত। এই ঋতুতে শিক্ষক য অশিক্ষক কর্মীদের যাবতীয় উদ্বেগঅশান্তি-কাজকর্ম পরীক্ষা ঘিরেই প্রধানত। এ-সময় কলেজ প্রাঙ্গণে ব্যবস্তার অন্ত নেই। ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের ও উদ্বেগের অন্ত নেই। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেমন আসবে, 'নোট', 'সাজেশান' কতটা টেলে তুলতে পারবে ইত্যাদি ভাবনা পরীক্ষার্থীদের তো আছেই। এ ভাবনা অভিভাবকদেরও। এ কালের অভিভাবকরা পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে ভিড় জমান। তাদের চোখ - মুখ দেখলে, কথাবার্তা শুনলে মনে হয় তাদের সন্তানরা এই বুঝি যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু - ঘাঁটিতে প্রবেশ করেছে! তার যদি ক্ষিদে পায়, যদি শরীর খারাপ লাগে, যদি মাথার ওপর ফ্যান না ঘোরে, যদি জল বা ওষুধ খেতে ভুলে যায়! উচ্চমাধ্যমিক ও পরের পর্যায়ের সমস্ত পরীক্ষার্থীই কিন্তু সাবালক। কিন্তু অভিভাবকরা -'মানতা নেহি'। অভিভাবকদের অতিরিক্ত নিরাপত্তা - ভাবনা, সন্তানস্নেহ আজকের শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলেই তো মনে হয়।

পরীক্ষার্থীরা নাবালক নয়। পরীক্ষা হলে তারা প্রবেশ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আশা নিয়ে। 'ভাল' ছাত্রদের চাই ভাল, আরও ভাল ফল, সাধারণ ছাত্রদের চাই ডিগ্রি, পাশ কার চাই। একই কেন্দ্রের একই হলে সাধারণ, বাল, অতি ভাল সব রকমের ছাত্রছাত্রীই ত্রসে পড়তে পারে পরীক্ষা দিতে। তাদের ওপর নজর রাখার কাজ শিক্ষকদের। শিক্ষকদের কাজ পরীক্ষার নিয়মনীতি যেন লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে নজর রাখা। পরীক্ষাপর্ব শেষে সরকারি বিজ্ঞপ্তি বা রিপোর্টে জোর গলায় ঘোষণা হয় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে সম্পন্ন।এ কালে পরীক্ষা - কেন্দ্রগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবার ঘটনা খুব কম। তবু, এখালে পরীক্ষা - কেন্দ্রগুলির ভেতরের পরিস্থিতিসন্তোষজনক বা প্রশংসনীয় কিনা - এই প্রশ্ন কেউ তুলতেই পানের। জানতে চাইলে পারেন, এই ঋতুতে শিক্ষকরা আছেন কেন।

'পশ্চি মবঙ্গের শিক্ষাচিত্র ঃ তখন ও এখন' (প্রকাশকঃ তত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চি মবঙ্গ সরকার) পুস্তিকায় পাই) খোলা মনে বিচার করলে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য সব থেকে উল্লেখযোগ্য তার একটি হল শিক্ষা (পৃ. ৎ)। শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরেছে, পরীক্ষা নিয়মিত নির্দিষ্ট সূচিদ মেনে হচ্ছে, গণ -টোকাটুকি বিদায় নিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের এই কৃতিত্ব বা সাফল্যের দাবি বিনা বাধায় বিনা প্রশ্নে প্রায় সকলে মেনে নিয়েছেন। তাই মিত্র কমিশন বা সরকার ঢাক যত জোরে পিটিয়েছেন তত যুক্তি-তথ্য পেশ করেননি, প্রয়োজন হয়নি। এই দাবি যদি সর্বাংশে সত্যহয় তাহলে মানতেই হয় পরীক্ষাকন্দ্রেগুলির পরিবেশ আদর্শ, পরীক্ষার হলে কর্তব্যরত শিক্ষকরা সুখে আছেন বাম রাজত্বে এ কতা অনেকাংশে সত্য, তার অনেক অন্য কারণ আছে, কিন্তু পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির পরিবেশ আজ আর সুখকর নয়। পরিবেশ বামফ্রন্ট রাজত্বের গোড়ায় যতখানি কলুষমুক্ত ছিল আজ আর ততখানি কলুষমুক্তক নয়। কেন এ কথা বলছি তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন, সেজন্য প্রয়োজন অতীতে ফিরে যাওয়া। বেশি পেছনে যাব না, ১৯৬৮-৬৯ থেকে শুরু করি।

১৯৬৮-৬৯-এ ন'লবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ -এ সারা বাংলা আলোড়িত। সমাজের সর্বক্ষেত্রে ধাক্কা লেগেছে। সে ধাক্কায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আলোড়িত বাংলার ছাত্র - যুবক সম্প্রদায়। মাও - এর রচনাবলীর অংশবিশেষ, রেকড বুক বিক্রি হচ্ছে খুব। ক্রেতাদের একটি বড় অংশ ছাত্রসম্প্রদায়। প্রাণে বিপ্লবের ডাক শুনে ছাত্রদের প্রবাবশালী সংবেদনশীল একাংশ কলেজ প্রাঙ্গণ ছেড়েছে ও ছাড়ছে। সে কালে বিদ্যাচর্চা পুরোপুরি 'নোট' বা 'সাজেশানস' - নির্ভর হয়নি, প্রাইভেট টিউশন হয়ে ওঠেনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিস্পর্ধী ব্যবসা। শিক্ষাকদের বহুলাংশ তখনও শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষায়তনের মর্যাদা রক্ষায় আন্তরিক। শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল আঘাত হেনেছে আন্দোলন, নবীন আদর্শ চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে সনাতন যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞানকে। দিশাহারা ছাত্রসমাজ, নবীন আদর্শ চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে সনাতন যক্তি- বুদ্ধি - জ্ঞানকে। দিশাহারা ছাত্রসমাজ, দিশাহারা শিক্ষকসমাজ। ভেতরে আদর্শের সঙ্কট, বাইরে সন্ত্রাসের আবহাওয়া, উত্তেজনা তুঙ্গে। এই পরিস্থিতির সুযোগে এবং এই পরিস্থিতির জন্য রাতারাতি পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির চেহারা বদলে যায়, শুরু হয় প্রকাস্য টোকাটুকি। শিক্ষকরা বাধা দিতে পারেন না, মেনে নিতেও শেখেননি। অনেক শিক্ষক পরীক্ষার হল ছেড়ে যান। শিক্ষা কখনই সরকার বা প্রশাসনের কাছে (যে যেমন দাবি করুন না কেন) - না এখন না তখন -অগ্রাধিকার পায়নি। সেই পর্বে আন্দোলনের জোয়ার সামাল দিতেই প্রশাসন কার্যত ভেঙে পড়েছে। শিক্ষাপ্রাঙ্গণের নৈরাজ্য দমনে কোনও রকম প্রশাসনিক সাহায্য তখন পাওয়া যায়নি। শিক্ষকরা যে রবীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ করেছিলেন তার কারণ কিছুটা ভীতি, নিরাপত্তার অভাববোধ, কিছুটা বিভ্রান্তি আর কিছুটা প্রতিবাদ। কোন দিক থেকে কোন প্রতিরোদ না থাকায় ছড়িয়ে পড়ল টোকাটুকি সর্বত্র, অবাধ এই টোকাটুকির নামই গণ - টোকাটুকি।

ন'লবাড়ি আন্দোলনের শুরু থেকেই 'বেআইনি' ও 'হঠকারি' বিপ্লব থামাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশ যে অত্যাচার শুরু করে, সাতে দশকের গোড়ায়, কংগ্রেস শাসনকালে সেই অত্যাচার নির্মমতার চরমে পৌঁছোয়। শুধু পুলিশ নয়, আধা সামরিক বাহিনী, এমনকি বহু আঞ্চ লে কোন কোন রাজনৈতিক দলের (বামপক্ষ ও ডানপক্ষ) একাংশ হাত মিলিয়ে ন'লপন্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। না এমন উথালপাথাল আন্দোলন, না রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন নির্বিচার অত্যাচার মানুষ দেখেছে এর আগে।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে বিরোধীপক্ষ বিধান সভায় যায়নি। বাইরেও তারা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে তোলেনি বা তুলতে পারেনি। ন'লবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ নানা কারণে স্তিমিত হয়ে আসে। সাদারণ মানুষের সামনে তখন কোন আদর্শ নেই, রাজনীতি নেই, আসার আলো নেই। দুটি সাংঘাতিক গুজব এ সময় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েঃ

(১) বাংলার ঘরে ঘরে বোমা বাঁধা হয়, (২) সব বাঙালি ছাত্র টুকে পাস করে। প্রথম গুজবটি হাস্যকর হলে উড়িয়ে দিতে পারল্যে দ্বিতীয় গুজবটি বিপদজনক ভাবে পল্লবিত হতে থাকে। বাংলার ছাত্ররা সমস্যায় পড়ে। ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস এই সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগ নেয়নি, নেওয়া সম্ভব ছিল না অথবা উদ্যোগের প্রয়োজনটাই বুঝতে পারেনি। কংগ্রেসের নবীন নেতৃত্বের ঐদ্ধ ত্যপূর্ণ আচরণও অন্তঃকলহ এবং বিরোদীপক্ষের উদ্যমহীনতায় ছাত্রসমাজ এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এই অন্ধকারই ছাত্রসমাজকে এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এই অনধকারই ছাত্রসমাজকে প্রকৃতপক্ষে আলোর সন্ধানে উদ্বদ্ধ করে, শুর হয় পরিবত৩ন প্রক্রিয়া। এই সময় ছাত্ররা লক্ষ করে যে পরীক্ষার ফল তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে, অনিয়মিত পরীক্ষাসূচি ও বিবিধ কারণে ফল প্রকাশে বিলম্ফ ঘটছে যার ফলে নষ্ট হচ্ছে এক থেকে দুই মূল্যবান বছর, পরীক্ষায় অবাধ টোকাটুকিতে যে ফল পাওয়া যায় তা মাঝারি মানের ওপরে যেতে পারে না সাধারণত। গণ-টোকাটুকির বিরুদ্ধ তা ভেতর থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে। এ-সময়ের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের একাংশের দাবিতেই যেসব কেন্দ্রে টোকাটুকির অভিযোগ পাওয়া যায় সেইসব কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে। টুকে পরীক্ষা দেওয়া চলবে না এই দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। অবস্য, এই আন্দোলনে রাজনৈতিক ‘দাদারা’ বাধা দিতে থাকে। টোকার সপক্ষে চাপ অব্যাহত থাকে, নানা কৌশলে টোকাটুকিতে মদত দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু লড়াইটা শুরু হয় এবং সেই লড়াই শিক্ষকদেরও পরীক্ষার হলে ফিরে আসতে উৎসাহিত করে। গণ - টোকাটুকিতে বাধা পড়ে।

এর কিছু পরে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। জরুরি অবশাত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করলেও গণ - টোকাটুকির মত্ন অপরাধ দমনে প্রশাসনিক সাহায্য অনেকটা নিশ্চি ত করে। সাতাত্তরে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার অনেক আগেই গণ-টোকাটুকি বিদায় নিতে সুরু করে, ফিরে আসতে শুরু করে শৃঙ্খলা। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর গণ - টোকাটুকি সম্পূর্ণ বিদায় নেয়। শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমর্থন নিশ্চি ত হয়। কিন্তু এই সরকারেরই উদ্যোগে তথা নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরেছে বা গণ-টোকাটুকি বিদায় নিয়েছে এমন দাবি অতিরঞ্জিত ও অনৈতিহাসিক।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে অতি অনুকূল পরিস্থিতে। এই সরকারের নেতৃত্বে পরীক্ষাকর্ম নির্দিষ্ট সূচি মেনে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফল - প্রকাশও, সর্বস্তরেই, নির্দিষ্ট সময়ে হয়। সরকার নিশ্চ য় এই দুটি ধারায় সাফল্য দাবি করতে পারে। তাদের আরও কৃতিত্ব এই যে এই সাফল্য তারা ধরে রাখতে পরেছে। টু চিয়ার্স। থ্রি চিয়ার্স বলা যেত যদি পরীক্ষা - হলের পরিবেশ সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত হত। গণ টোকাটুকি বিদায় নেবার পর তেমনটাই আশা করা গিয়েছিল এবং প্রথম কয়েকটি বছর পরিবেশ অত্যন্ত আদর্শ পরিবেশের খুব কাছাকাছি ছিল। কিন্তু সেই পরিবেশ রক্ষা করা গেল না। কর্তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থে চালিত হওয়ায় সুস্থ ও আদর্শ পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সুযোগ গড়ে দিলেন, পতন শুরু হল।

সুস্থ ও আদর্শ পরিবেশ নষ্ট হবার অন্যতম প্রধান কারণ উচ্চশিক্ষার সিংহদ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। মিত্র কমিশন উল্লেখ করেছেন রাজ্যের স্নাতক কলেজগুলিতে প্রচুর সংখ্যাক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, প্রদানত পাস কোর্সে, যার মূল কারণ এই যে তাদের অন্য আর কিছু করার নেই (অনুচ্ছেদ ২.৪৪)। ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৯১-৯২ -এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে চাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭৩ শতাংশ, ডিগ্রি স্তরে বৃদ্ধি র পরিমাণ ৫০ শতাংশ (মিত্র কমিশন, সারণি ২.৯)। কলেজের সংখ্যা সে তুলনায় বাড়েনি বেং ইউ. জি. সি. বিধি মানলে এক দশমাংশ বা তার্য বেশি কলেজ স্বীকৃতি পাবার অযোগ্য (মিত্র কমিশন, অনুচ্ছেদ ৮.৬)। এই বিপুলছাত্রবৃদ্ধি র চাপে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। যে - পরীক্ষাকেন্দ্র ১০০ জন পরীক্ষার্থীর সুষ্ট ব্যবস্থা করতে অক্ষম সেই কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী হাজির হয় ২০০ বা তারও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষার্থীদের বিবরণ, ডেসক্রিপটিভ রোল, আসে শেষমূহূর্তে। পরীক্ষাতেন্দ্র পরিচালনায় যাঁরা থাকেন তাঁরা পরীক্ষার্থীদের বসার যেমন তেমন আয়োজন করেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে সুষ্ঠ নজরদারি সম্ভব হয় না।

এই সময়কালে প্রশ্নপত্রের ধরনও বদলেছে। পাস পেপারে, এবং অনার্স পেপারেও, প্রচুর খুচরো প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষাথীদের অনেকেই সেইসব প্রশ্নের উত্তর লেকার একটি সহজ পথ খুঁজে পায় যার নাম, পরীক্ষাপার্থীদের ভাষায়, ‘হল কালেকশান’, নজরদারি দুর্বল হওয়ায় যা ঠেকানো সম্ভব হয় না। এও সামান্য, এখন পরীক্ষার হলে টুকল্যে তা কি ঠেকানো সম্ভব? অসদুপায় অবলম্ফন্রে জন্য যদি কেউ ধরা পড়ে তাহলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ নয়। শিক্ষকের রিপোর্ট যথেষ্ট নয়, এখন পরীক্ষার্থীকে দিয়ে লিখিয়েনিতে হবে ঘটনার বিবরণ বা স্বীকারোক্তি। তা এমন বোকা পাওয়া যায় কোথায় যে লিখবে)চুরি করিয়াছি!

এ-আমলে টোকাটুকি ফিরে অসেছে কিছুটা এবং তা ফিরেছে নিয়মবিধি ও অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে। গণ-টোকাটুকি ফেরেনি তার ফেরা সম্ভব নয় বলেই। সম্ভব নয় কারণ, উচ্চাকাঙক্ষী ভাল ছেলেমেয়ের দল জানে টোকাটুকি করে তেমন ভাল ফল পাওয়া যঅয় না এবং চাকরির বাজারে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সাধারণ মানের কিছু ছাত্র সাধারণ মানের ডিগ্রির আশায় যদি ব্যবস্থার বা নিয়মের সুযোগ নিয়ে টোকে তো তা নিয়ে ভাবে কে? কোন হৈ চৈ না হলেই হল। সরকার তথা আজকের শিক্ষাকর্তারা এই পরিস্থিতিকেই বাস্তব বলে যেন গ্রহণ করছে। তাদের ভঙ্গি অনেকটা যেন)চাকরি নাই বা পেল ডিগ্রিটা তো পাক। তংরা সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে চান শিক্ষার প্রগতি, শিক্ষার মান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাতের দশকের গোড়ায় যে - শিক্ষককুল টোকাটুকিতে বাধা দিতে না পেরে বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে পরীক্ষা হল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তাঁরা এখন হাল ছেড়ে আসতে পারেন না। ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে’ শিক্ষকরাও বহুলাংশে আদর্শচ্যুত, একাংশ হতাশ। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ১৯৭৭ -এর পরে ‘গৌরবময় যুগের’ সাফল্য-হার ১৯৭৭ - ত্রর আগের ‘অন্ধকার যুগের’ সাফল্য - হারের চেয়ে ভাল নয়। তাই ঢাক যতই বাজুক বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। সঙ্গীর্ণ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত বর্তমান সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃরে ক্ষুদ্র বুদ্ধি র এই হল পরিণাম। আমরা আবার এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করছি।

Jalarka – Kabita – Short – Chandrabindu - Pradip Royguptta

জলার্ক - চন্দ্রবিন্দু - প্রদীপ রায়গুপ্ত

অনেক পরামর্শে পর দুজন ভাষাতাত্ত্বিক ও একজন উচ্চারণবিদ মিলে
চন্দ্রবিন্দুটিকে বাংলা বর্ণমালা থেকে ছেঁটে ফেললেন আর অমনি দুরন্ত রাগে
নিজের মাথা থেকে চন্দ্রবিন্দু খুলে পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মারলো চাঁদ।
বিশাল নৌকোখানার এক প্রান্ত এসে আটকে গেলো কাকদ্বীপের কাছে
সমুদ্রবেলায়, অন্য প্রান্তটি গিয়ে পড়লো আন্টার্কটিকার পেঙ্গুইন উপনিবেশে।
দলে দলে মানুষ ছুটলো কাকদ্বীপে। নৌকোর উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটেই
নিখরচায় তারা যাবে আন্টার্কটিকায় বেড়াতে। কিন্তু যাবে কী করে? রাজ্যের
ইদুর বাঁদগর পেঁচা হাঁস তাঁতি ফাঁসুড়ে পেঁপে পেঁয়াজ হাঁড়ি ঠোঁট হোঁচট
শাখা সিঁদুর বাঁকুড়া কংথি মেন কী আমাদের সাধের বাংলার পাঁচ পর্যন্ত
কাকদ্বীপে গিয়ে ভিড় করেছে। তারাও যাবে আন্টার্কটিকায়, তবে স্বেচ্ছানির্বাসনে।
ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির মধ্যে স্বপ্নবৃত্তান্তটি লিখতে যাবো, দুলে উঠলো
চাঁদের নৌকো। আন্টার্কটিকা থেকে কয়েক হাজার পেঙ্গুইন মার্চ করতে করতে
এগিয়ে আসছে, ওরা আমাদের ভাষাজ্ঞান উচ্চারণ ও ঐতিহ্যবোধের দখল নেবে।